35

তারিখ ... 20 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

বয়স্ক শিক্ষা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত?

ডঃ এম, এ জামান

একটা দেশ বা জাতির প্রাথমিক পরিচিতিই হল সে দেশে শিক্ষার হার কেমন! যে দেশে শিক্ষার হার নিম্ন সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও হয় নিম্নস্তরের।

এখন শিক্ষার অবস্থাটা বর্ণনা করা যাক ঃ ১৯৫১ সালে এদেশে নিরক্ষর লোক ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ। ১৯৮৩-তে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি ১৮ লক্ষ। ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ৮০ লক্ষের উর্ধ্বে। তাহলে ঘটনাটা দাঁড়ায়, স্বাধীনতা লাভের ২৩ বছর পর আমাদের প্রায় ৮ কোটি জনগণ নিরক্ষর।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বর্তমানে ৬০-এর দশকের ৩% থেকে কমে ১৯৯৩ সালে ২.২%-এ নেমে এসেছে। তবুও বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক।

সমসাময়িককালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিশেষ করে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর শিক্ষার হার নিম্নরূপ ঃ ভারতে ৫২.১%, ভুটানে ৩৮%, নেপালে ২৬%, শ্রীলংকায় ৮৮.৫%, মালদ্বীপে ৯৮.২%, পাকিস্তানে ৩৫%, মায়ানমারে ৮১%, থাইল্যান্ডে ৯৩%, সিঙ্গাপুরে ৯১%, হংকং-এ ৮৮.১%, ফিলিপাইনে ৯৩.৫%, ভিয়েতনামে ৮৮%, লাউসে ৮৩.৯%, কম্বোডিয়ায় ৪৮% এবং জাপানে ১০০%।

জাপানে কোন নিরক্ষর লোকই নেই। জাপান আজ পশ্চিমা বিশ্বের মত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। উন্নতবিশ্বে বিশেষ করে জাপানের মত দেশের পরিবেশই এমন হয়েছে যে, বর্তমানে সেখানে নিরক্ষর থাকাই সম্ভব নয়।

তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের শিক্ষার হার প্রায় এক। আর নেপাল বাদ দিলে সকলের চেয়ে আমাদের দেশের শিক্ষার হার কম। অথচ বিগত ৪০ বছর আগে আমাদের দেশের শিক্ষার হার অনেক দেশের চেয়েই বেশী ছিল।

বিগত ৪ বছর যাবত আমরা উন্নয়নের পথে না গিয়ে নিজেদের সাথেই নিজেরা প্রতারণা করেছি। এতদিন আমরা রাজনীতি করেছি। রাজনীতির লক্ষ্য নাকি উন্নয়ন। তবে আমাদের এই অনগ্রসরতা কিসের প্রমাণ দেয়? আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য উন্নয়ন পরিপন্থী কর্মকান্ড! আমরা যা বলি হয় তাই-ই মিথ্যা নয়তো যা করি তাই-ই মিথ্যা। অথবা বলা বা করা উভয়ই মিথ্যা। নচেত সবদেশে উন্নয়ন হয় আমাদের হয় না কেন?

আমরা সাধারণত অন্যের দোষ দেই। কখনও বিদেশের দোষ, কখনও স্বদেশের বিভিন্ন দলের। এক দল অন্য দলের। এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর। কখনও একজন অন্য জনের। কিন্তু কেউ নিজেরা দোষ স্বীকার করি না। নিজেরা কখনও দোষ করি না।

আমাদের স্কুলসমূহের (বিশেষ করে গ্রামের প্রাথমিক স্কুল) শিক্ষকবৃন্দ যাদের বাড়ীর নিকটে স্কুল সংসারের কাজ সেরে সময়ের অনেক পরে এবং স্কুল ছুটির অনেক আগেই বাড়ী ফেরেন- শুধু তাই নয়, তাঁরা স্কুলে যান রেস্টের জন্য। অনেকেই ঝিমাতে থাকেন। আবার, স্কুলের সংখ্যাও খুবই কম।

গ্রামে যে স্কুলগুলো আছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের জায়গারও ভাল সংকুলান হয় না। ঠেলা-ঠেলি, ঝগড়াঝাটি, মারা-মারিতে অনেকেই স্কুলের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আবার বিরক্ত শিক্ষকগণ বেত দিয়ে যেভাবে গরু পেটা করেন, তাতেও বহু শিক্ষার্থী স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেক স্কুলেই খেলার জায়গা নেই, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নেই- সে পরিবেশও নেই। স্কুল ছাড়ার অর্থনৈতিক কারণ তো আছেই, এসব কারণও কম দায়ী নয়। অনেক স্কুলে খাওয়ার পানির বন্দোবস্তও নেই। অনেক স্কুলে টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। কোন কোন স্কুলে একটা টয়লেট থাকলেও তা এত লোংরা যে ব্যবহারের অযোগ্য।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং হার উন্নয়ন করার প্রয়াস হিসাবে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিভিন্ন বিষয়ে ভেবে-চিন্তে ১৯৮০ সালে গণসাক্ষরতা কর্মসূচী নামে একটা প্রকল্প গ্রহণ করেন। এতে মোটামুটি ভাল ফল লক্ষ্য করা গেল। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব শাহ আজিজুর রহমান এ প্রকল্পকে গণশিক্ষা কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করেন।

ব্যাপক ভিত্তিতে না হলেও দেশব্যাপী নিরক্ষরের মধ্যে একটা শিক্ষা স্পৃহা জেগে উঠতে শুরু করল। কিন্তু হঠাৎ কোরেই এ প্রচেষ্টা বন্ধ ঘোষিত হল। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর এ কর্মসূচী বন্ধ করে দিলেন। কয়েক বছর পর সমালোচনা শুরু হলে একটা কমিশন গঠন করা হয় কর্মসূচীটি পুনঃ প্রবর্তন করার বিষয় নিয়ে। তৎকালীন শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমানের বিশেষ প্রচেষ্টায় এ কর্মসূচীটি আবার চালু হয়। ১৯৮৮ সালে সীমিত আকারে এ কর্মসূচী শুরু হয় এবং ধীর গতিতে চলতে থাকে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এ গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাপকভিত্তিতে করার মানসে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম রূপান্তরিত করেন। এ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন সচিব নিয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর আওতায় একজন প্রতিমন্ত্রীর সহযোগিতায় কর্মসূচীটি পরিচালিত হচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। যেমন প্রাক প্রাথমিক ৪ থেকে ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য। মৌলিক ৬-১০ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য। ১০-১৪ কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক শিক্ষা ১৫-৩৫ বা ৪৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষা গ্রহণে সার্বজনীন ব্যবস্থা।

এ কার্যক্রমের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ৮,৩৭,০০০ (আট লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার) বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষাদান করা হবে। ২০০০ সালের মধ্যে ৩৫.৩% সাক্ষরতার হারকে ৬৫% সাক্ষরতার হারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

১৬৮টা বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস হতে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয় বহির্ভূত বিদ্যালয় ত্যাগী গরীব অসহায় শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক মৌলিক ও বয়স্ক নারী পুরুষের জন্য অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। এ বছর প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও বিস্তৃতি ঘটে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার অবশেষে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এক ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ- সচেতন মানুষের মনে এক অনাবিল আশার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ এসএসসি পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ এবং ভাতার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রেখে পরিচালনা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

তবে আমার মনে হচ্ছে আরও অন্য কিছু। বাংলাদেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই'। অর্থাৎ নিশ্চিত ফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত শুধু উদ্যোগ কর্মকান্ডই সব নয়। বিশেষ করে, এই গণফর্মাল বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেই আমলাদেরই উপর আর এখানেই সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ কাজ করবে ঠিকই, কিন্তু এর সার্বিক দায়ি-দায়িত্ব এবং ব্যবস্থাপনা রয়েছে আমাদের হাতে।

বাঙ্গালী জাতিমাত্রেই নাকি মাতব্বরীকে ভালবাসে। বিষয়টি পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হম্বিতম্বিতে। কি হম্বিতম্বি, কি হাঁকডাক, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অমুকের অফিস ছোট, অমুকের লোকজন কম, অমুকের সাইনবোর্ড ছোট, অমুকের সাইনবোর্ড আছে- অফিস খুঁজে পাওয়া যায় না ইত্যাদি। ঠিক যেন টেন্ডার নোটিশের পর কারা লোয়েস্ট হল এবং তাদের কাজ দেয়া যায় কি-না কর্তৃপক্ষ এ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন বিধায় সেই মত ব্যবস্থা গ্রহণের তোড়জোড়। কি দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি, অফিসারদের তোয়াজ, আবার ইন্সপেকশন, আবার কাজ বহাল এইসব কর্মকান্ড চলল মাস দুই ধরে। তার পর এই পাঁচ মাস সব তোড়জোড় ঠান্ডা হিম হয়ে গেছে। শিক্ষক, ছাত্র, সুপারভাইজারগণ কিছু দিন লেফট-রাইট করে তারাও সাইলেন্ট হয়ে গেছে। এনজিও কর্মকর্তাগণও বারে বারে ধরনা দিয়েছে। অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরাও বিরক্ত বোধ করেন। বলেন, চিঠি যাবে অফিসে আসার দরকার নেই। চিঠি অবশ্য ৪ মাস পর গিয়েছে একই বারতা নিয়ে, অপেক্ষা করুন এখনও বই ছাপা হয়নি। গত বছর নভেম্বর থেকে এ বছর আগস্ট মাস পর্যন্ত এ কর্মকান্ডের মনিটরিং হল এনজিও সিলেকশন, একদিনেও রিটেশন এবং সুপারভাইজারদের টেনিং-এর জন্য সময় ব্যয় হল ৫ মাস। আর এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত বই ছাপা চলছে। শেষ হবে কবে কেউ বলতে পারে না।

এখানে বই ছাপার ক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ করার মত। এনজিও কর্মকর্তাগণের অনেকেরই বই প্রিন্টিং-এ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তারা এ কাজে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই জড়িত। আবার অনেক এনজিওর নিজস্ব আধুনিক ছাপাখানাও আছে। কাজেই বাঙ্গালীকে হাইকোর্ট দেখানোর ফুরসত এখানে খুবই কম।

এই হল তোড়জোড়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকত।

আমরা শুনেছি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের ধরনের টাকাও আসে বিদেশী সাহায্যের তহবিল থেকে। এই প্রকল্পের অর্থ যোগান হচ্ছে "নুরাডের" সাহায্য অর্থ থেকে। আর এ অর্থ দেয়া হয়েছে জনগণের শিক্ষার জন্য নিরক্ষর দূরীকরণের জন্য। এই টাকা হরিলুটের খেলা পরিচালনার জন্য নয়। মাথাভারী প্রশাসন বলে একটা কথা আছে আমাদের দেশে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও এটা নতুন করে দেখা যাচ্ছে। মূল শিক্ষার্থীরা বা শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী অংশ অন্যত্র খরচ হচ্ছে কিন্তু আসল কাজ কতটুকু হচ্ছে পুনরায় তা ভেবে দেখার দরকার আছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেও আজ ২৩ বছর আগেকার কথা। এদেশে এখনও নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৬৫%। এখনও কি আমাদের হুঁশ হবে না?